কৃষি ও দ্রব্যমূল্য

চালের দাম ও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি

ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ

সাধারণ মানুষের কাছে অর্থনীতির সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হলো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারদরের ওঠানামা। যে কারণে রাজনৈতিক বিবেচনাতেও এটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সম্ভবত সবচেয়ে সংবেদনশীল বিষয়। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ রুডিগার ডরনবুশ সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতার বিষয়ে একটি গবেষণায় দেখিয়েছেন, বিশ্বব্যাপী সরকারসমূহের শাসনামলে অর্থনৈতিক বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীরাই মন্ত্রিসভার রদবদলের শিকার হন সবচেয়ে বেশি এবং তাদের মন্ত্রিত্বের মেয়াদকালের সঙ্গে মূল্যস্ফীতির হারের নেতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। লক্ষণীয় যে, বিগত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটিই ছিল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অসহনীয় বোঝা লাঘব করা।

এ বিষয়ে যুক্তিগ্রাহ্য আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই পরিষ্কার করা দরকার যে স্বাভাবিক প্রত্যাশিত হারের মূল্যস্ফীতি আর হঠাত্ দ্রুত মূল্যস্ফীতি দুটি ভিন্ন বিষয়। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সংগতি রেখে বিভিন্ন পণ্যের দাম, উৎপাদন-খরচ, বেতন-মজুরি—সবকিছুই সমান তালে বাড়ে, কিছুটা আগে-পরে হলেও। এ ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার মানের ওপর মূল্যস্ফীতির প্রভাব খুব গৌণ। বরং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয়-উপার্জনের সুযোগ কত দ্রুত বাড়ছে, সেটাই বড় কথা। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ধনী ও গরিব দেশের মধ্যে জীবনযাত্রার মানের বিরাট ব্যবধানের মূল কারণ হলো মাথাপিছু উৎপাদনক্ষমতার পার্থক্য; পণ্যের মূল্যস্তর বা মূল্যস্ফীতির হারের তারতম্য দিয়ে এটি নির্ধারিত হয় না।

তবে হঠাত্ অস্বাভাবিক দ্রুত হারে মূল্যস্ফীতি হলে তাতে যে জনজীবনে ভয়াবহ দুর্ভোগ সৃষ্টি হতে পারে, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। এর কারণ দুটি—প্রথমত, এ ধরনের মূল্যস্ফীতির ফলে অর্থনীতিতে আয়ের বড় ধরনের পুনর্বণ্টন ঘটে। একদিকে ব্যবসায়ী ও উৎপাদক শ্রেণী লাভবান হয়, অন্যদিকে দিনমজুর থেকে শুরু করে চাকরিজীবী পর্যন্ত স্থির-আয়ের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উপরন্তু কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে বাজারদর অস্বাভাবিক বাড়ার ফলে প্রকৃত কৃষকদের চেয়ে ব্যবসায়ী ও মধ্যস্বত্বভোগীদেরই বেশি লাভবান হতে দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়ার ফলেই এ মূল্যস্ফীতি ঘটে, তবে নিম্নবিত্তের মানুষের ওপর তা বাড়তি বোঝা হয়ে দেখা দেয়। কারণ, তাদের আয়ের বড় অংশই ব্যয় করা হয় এসব পণ্যের ওপর।

বাংলাদেশ ছিল ২০০৭-০৮ সালের বিশ্বব্যাপী খাদ্যসংকটের অন্যতম ভুক্তভোগী দেশ। তখন আমাদের দেশের বাজারে মোটা চালের খুচরা দাম ৩৩ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল, এক বছর আগে যে দাম ছিল ২০ টাকার কম। দীর্ঘ মেয়াদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জনসমর্থন হারানোর পেছনে এটা ছিল একটা বড় কারণ। লক্ষণীয় বিষয় যে, ২০০৭-০৮ অর্থবছরেও কিন্তু আমাদের জিডিপি ও জাতীয় আয়ের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরগুলোর মতোই ছিল—৬ শতাংশের ওপর। (স্থিরমূল্যে, অর্থাত্ মূল্যস্ফীতির প্রভাব বাদ দিয়ে) এ হিসাব সঠিক হলে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের বিচারে সে বছর মাথাপিছু আয় প্রকৃত অর্থে বেড়েছিল ৪-৫ শতাংশের মতো। বলা বাহুল্য, যেসব গরিব মানুষ তখন অনাহার-অপুষ্টির শিকার হয়েছিল, তাদের কাছে জাতীয় আয়ের এ পরিসংখ্যানের তাৎপর্য সামান্যই। স্পষ্টতই স্বল্প মেয়াদে দারিদ্র্যের নিয়ামক হিসেবে খাদ্যের মূল্যস্ফীতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

কৃষিপণ্যের দাম সামগ্রিক মূল্যস্ফীতির অনুপাতে কী হারে বাড়ে, সেটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের দাম তুলনামূলকভাবে কম রাখা গেলে নিম্নবিত্ত মানুষ সরাসরি উপকৃত হয়। শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানোর জোর দাবিও ওঠে না। কিন্তু এর ফলে কৃষির প্রণোদনা কমে গিয়ে

উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আপাতদৃষ্টে রাজনৈতিকভাবে আকর্ষণীয় মনে হলেও এ ধরনের নীতি অনেক দেশেই কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি ও খাদ্যনিরাপত্তার জন্য শেষ পর্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে।

উনিশ শ আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে পরবর্তী দেড় দশকে বাংলাদেশে ধান-চালের দাম মূল্যস্ফীতির তুলনায় অনেক কম বেড়েছে। এ সময়ের মধ্যে (১৯৮৫-৮৬ থেকে ১৯৯৯-২০০০) মোটা চালের খুচরা দাম কেজিপ্রতি সাড়ে আট টাকা থেকে চৌদ্দ টাকা পর্যন্ত বাড়লেও অর্থনীতির মূল্যসূচকের অনুপাতে আসলে এ দাম কমেছে প্রায় ৩০ শতাংশ। এর কারণ ছিল জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্যশস্যের (ধান ও গম) উৎপাদন কিছুটা বেশি হারে বাড়া এবং ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে বেসরকারি খাতে খাদ্যশস্যের অবাধ আমদানির সুবিধা দেওয়া। ওই বছর থেকে আমাদের যখনই চালের ঘাটতি হয়েছে, ভারত থেকে বাণিজ্যিক আমদানির মাধ্যমে তা মেটানো গেছে। সে সময় ভারতে চালসহ খাদ্যশস্যের বিশাল মজুদ গড়ে উঠেছিল এবং টাকার বিপরীতে ভারতীয় রুপির অবমূল্যায়নের ফলে সস্তায় চাল আমদানি সম্ভব হয়েছিল। এ ছাড়া এ সময়ের মধ্যে আমরা চালের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কাছাকাছিও চলে এসেছিলাম।

সাম্প্রতিক কালে বিশ্বব্যাপী খাদ্য-পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটেছে, যা ২০০৭-০৮ সালে এসে বড় সংকটে রূপ নেয়। এরপর অবস্থার কিছু উন্নতি হলেও বিশ্ববাজারে চালের দাম এখন আবার চড়া। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বে সস্তা খাদ্যশস্যের দিন সম্ভবত শেষ হয়ে গেছে। উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের দেশ হিসেবে পরিচিত ভারতকে ২০০৬ সাল থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশে বিগত কয়েক মৌসুমে ধানের ভালো ফলন হওয়ায় এ মুহূর্তে আমাদের চাল আমদানি করতে হচ্ছে না, যদিও গমের আমদানি অব্যাহত আছে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাল আমদানি করতে হলে দেশের বাজারে চালের দাম এখন যা আছে তা থেকে অনেক বেশি হতো।

ধান-চালের দাম (খুচরা ও কৃষক পর্যায়ে) কেমন হলে ভবিষ্যতে দেশের বাজারে উৎপাদন ও চাহিদার ভারসাম্য বজায় থাকবে, সেটি অনেক বিচার-বিশ্লেষণের বিষয়। তবে সার্বিক মূল্যস্ফীতির সঙ্গে অবশ্যই এর একটা সামঞ্জস্য থাকতে হবে। বিগত বছরগুলোতে বিশেষত ২০০৩-০৪ সাল থেকে মূল্যস্ফীতির হার বেশ বেড়েছে। শ্রমিকদের মজুরি থেকে শুরু করে সবকিছুর দাম বেড়ে অর্থনীতিতে নতুন আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য তৈরি হয়েছে। সে হিসাবে মোটা চালের খুচরা দাম এখন কেজিপ্রতি ২৩-২৪ টাকা পর্যন্ত হলেও তাকে অসংগত বলা যেত না। তবে চালের দামের আলোচনা যে শুধু অর্থনৈতিক যুক্তি দিয়ে হয় না, তা টেলিভিশনের টক শোতে এ নিয়ে বড় দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক থেকেই বোঝা যায়। এসব বিতর্কের একমাত্র মূল বিষয় হলো, অতীতের কোন সরকারের আমলে চালের দাম কত কম ছিল। এ ছাড়া বিগত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রচারাভিযানে চালের দাম নিয়ে অতিরিক্ত আশাবাদী প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কারণেও বিষয়টি নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার বদলে এটি এখন কেবল রাজনৈতিক বিতর্কের হার-জিতের প্রশ্নে পরিণত হয়েছে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার কয়েক মাস আগ থেকেই দেশের বাজারে চালের দাম দ্রুত কমতে শুরু করে। এর পেছনে কাজ করেছে ধানের ভালো ফলন ও খাদ্যশস্যের সরকারি মজুদ গড়ে তোলা। চলতি অর্থবছরে আউশের উৎপাদন সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সরকারি হিসাব অনুযায়ী, আমন ধানের রেকর্ড পরিমাণ উৎপাদন হয়েছে এবং বোরো ধানের ফলনও ভালো হবে বলে আশা করা হচ্ছে। কিন্তু বাজারে আমন ধান ওঠার পরও বর্তমানে মোটা চালের খুচরা দাম কেজিপ্রতি ২৮ টাকায় উঠেছে কেন—এ নিয়ে অনেক আলোচনা-বিতর্ক হচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রচলিত ধারণা এবং সরকারের পক্ষ থেকে অভিযোগ হলো, চালের বাজারের কোনো ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট কারসাজি করে অযৌক্তিকভাবে দাম বাড়াচ্ছে। তা সত্য কি না, সেটা অনুসন্ধানের বিষয়। তবে এর ভিন্ন ব্যাখ্যাও হতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, চালের মতো মৌসুমি কৃষিপণ্যের বাজারে একবার বড় ধরনের অস্থিতিশীলতার ঘটনা ঘটলে তার জের সহজে যায় না। ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভবিষ্যতের দামের প্রত্যাশা নিয়ে এক ধরনের অনিশ্চয়তার ভাব তৈরি হয়; ফলে যে লাভ-খরচের হিসাবের ভিত্তিতে তারা পণ্য মজুদের সিদ্ধান্ত নেয় তাতেও গোলমাল হয়ে যেতে পারে। গত বছরও আমন ধান ওঠার পর চালের দাম প্রথম দিকে আশানুরূপ কমেনি। মোটা চালের যে খুচরা দাম

২০০৯ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে কেজিপ্রতি ২৩-২৪ টাকা ছিল, তা বোরো ধান ওঠার আগেই এপ্রিল-মে মাসে ১৯ টাকায় নেমে এসেছিল। কাজেই ব্যবসায়ীরা বেশি দামের প্রত্যাশায় মজুদ করে সব সময় যে অতিরিক্ত মুনাফাই করেন, তা ঠিক নয়। কখনো কখনো লোকসানও গুনতে হয়। বাজারে চাহিদা-সরবরাহ ও দামের সঠিক পূর্বাভাস পেতে হলে ব্যবসায়ী ও নীতিনির্ধারক সবার জন্যই আরও নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রয়োজন। কৃষি উৎপাদনসংক্রান্ত সরকারি পরিসংখ্যানের বর্তমান যে হাল, তাতে উৎপাদনের হিসাবের ভিত্তিতে বাজারদরের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেয়ে বরং বাজারদর দেখে উৎপাদন সম্পর্কে ধারণা করা খুব অযৌক্তিক হবে না। এ ছাড়া, ভবিষ্যতে যদি চাল আমদানির ওপর আমাদের নির্ভর করতে না হয়, তাহলে চালের বাজার স্থিতিশীল রাখতে সরকারের খাদ্যশস্যের মজুদ ও বিতরণব্যবস্থার আরও অনেক সম্প্রসারণ প্রয়োজন হবে।

বর্তমান সরকার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষে কৃষিঋণ বিতরণ, কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও কৃষি ভর্তুকির বিষয়ে নানা প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে কৃষি উপকরণের ওপর ভর্তুকি দিয়ে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চালের দাম কম রাখা যাবে—এ রকম অনুমানের ওপর নির্ভর করে কৃষিনীতি তৈরি করা ঠিক হবে না। ভর্তুকির পরিমাণ শেষ পর্যন্ত বাজেটের অর্থসংকুলানের ওপর নির্ভর করবে। কৃষি উপকরণের ওপর ভর্তুকিকে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্যের মাধ্যমে প্রণোদনা দেওয়ার বিকল্প হিসেবে ভাবাও ঠিক নয়। আর ভর্তুকি দিয়ে উৎপাদন বাড়ানো গেলেও চালের বাজারদর নির্ধারণে অন্য অনেক উপাদান কাজ করে। এ ছাড়া, কৃষির ভর্তুকি কৃষকের কাছে পৌঁছায় কি না এবং এ ভর্তুকি কৃষকের জন্য শুধু আর্থিক সহায়তা না হয়ে আসলেই বাড়তি উৎপাদনের প্রণোদনা হিসেবে কাজ করে কি না, তা বিচার-বিশ্লেষণ করেই কেবল ভর্তুকির নীতি তৈরি করা উচিত।

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা হবে—এ রকম একটি প্রতিশ্রুতির কথা রাজনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকদের কাছ থেকে প্রায়ই শোনা যায়। হঠাৎ দ্রুত মূল্যস্ফীতির ফলে জনজীবনে যে বাড়তি দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়, তার কথা মনে রেখেই সম্ভবত এ ধরনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ বলতে কাদের বোঝায়? স্বাভাবিক সময়েই আমাদের জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪০ শতাংশ এখনো দারিদ্র্যের কারণে অনাহারে থাকে; অর্থাৎ খাদ্য থেকে প্রয়োজনীয় ক্যালরির চাহিদা মেটানোর মতো ক্রয়ক্ষমতা তাদের নেই (সর্বশেষ ২০০৫ সালের সরকারি জরিপের হিসাব অনুযায়ী)। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ আর দীর্ঘমেয়াদি দারিদ্র্য ও অনাহারের প্রতিকার স্পষ্টতই দুটি ভিন্ন বিষয়। এ ছাড়া, খাদ্যমূল্যস্ফীতির বিষয়ে যতটা রাজনৈতিক সংবেদনশীলতা দেখা যায়, অর্থনৈতিক মন্দা বা শস্যহানির কারণে গরিব মানুষের জীবিকার সংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হলে সাধারণত তেমনটি দেখা যায় না। অথচ, সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে শেষোক্ত বিষয়টি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক দ্য ইকোনমিস্ট-এর ১৬ জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করে শেষ করছি। যুক্তরাষ্ট্রের চলমান মন্দার কারণে প্রায় ১৬ লাখ নিউইয়র্কবাসীকে এখন 'ফুড স্ট্যাম্প'-এর মাধ্যমে সরকারি খাদ্য সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। এ ছাড়া ব্যক্তি উদ্যোগে যে অসংখ্য লঙরখানা খোলা হয়েছে, সেখান থেকে নিউইয়র্কের প্রায় ২০ শতাংশ শিশুর খাদ্যের সংস্থান করা হচ্ছে। ওয়ালস্ট্রিটের যেসব বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইতিপূর্বে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল, তাদের পাশেই রয়েছে 'ফুড ব্যাংক' নামের এ রকম একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান। বলা হচ্ছে, ওয়ালস্ট্রিটের এটিই এখন একমাত্র 'ব্যাংক', যার ওপর মানুষ আস্থা রাখতে পারে। এ-ই যদি হয় পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশের অবস্থা, তাহলে আমাদের মতো দেশকে তো খাদ্যনিরাপত্তার বিষয়ে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।

ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, চেয়ারপার্সন, ইকনমিক রিসার্চ গ্রুপ ও অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
(প্রবন্ধটি ২০১০ শালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী দৈনিক প্রথমআলো পত্রিকায় প্রকাশিত)